উদাহরণযোগ্য তিনজন

ধীমান সান্যাল

ও আট দশকের ছোটগল্পের অভিমুখ

এই সময়ে তিনজন, সৃষ্টিশীল, অলোক গোস্বামী --- শুভংকর গুহ -- দেবব্রত দেব ইতিমধ্যেই বিজ্ঞজনের দৃষ্টি কথাকার হিসেবে আকর্ষণ করেছেন। কালের চিহ্নগত কারণে এরা সম্পর্কিত হলেও স্থানিকভাবে এঁরা বিস্তর দূরের। আলোক থাকেন উত্তরবঙ্গে, শুভংকর কলকাতার শহরতলী আর দেবব্রত ত্রিপুরা। প্রত্যেকেই একালের যুবক, মননশীল, অন্যধরণের কথাসাহিত্যচর্চা করেন। বাংলা মাতৃভাষা এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয় কিন্তু বাংলায় কথা বললেই যে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে উৎসাহ থাকবে, তা নাও হতে পারে। শোনা যায় মাত্র ৫ শতাংশ বাঙালী সাহিত্য পড়েন আর সিরিয়াস পাঠকতো সংখ্যায় খুবই কম, এখন প্রায় বিন্দুর মত। বিনোদন এখন ঘরের বৈঠকখানায়, অনায়াস, আলোচনা প্রায় বন্ধ। তবুও আগে না কি, শোনো কথা, ৰিবিদ্যালয়ের ছাত্র - ছাত্রীরা আবরণে সমাজ-বিনাশী অনেক যুবক রাজনীতি - সমাজ - সংস্কৃতি - সাহিত্য থেকে যোজন দূরে, এটাই তাদের বাঁচার স্টাইল। কাজেই সময়ের মারে প্রায় অনালোচিত আলোক--- শুভংকর --- দেবব্রত যথেষ্ট ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও হৈ চৈ ফেলতেপারেননি। এদের পিছনে বৃহৎ পুঁজি অথবা ক্ষমতাবানদের আবেগ, কিছুই নেই।

একথা প্রায় সংস্কারের মত মর্যাদা পাচ্ছে যে, যা কিছু লেখালিখি তা সাত দশককে তারপর আটের দশকে প্রায় কিছু নয় তুলনায় নয়ে আবার কিছু হচ্ছে। কথাসাহিত্য - কবিতা সর্বত্র এই একই প্রচার। ঐতিহ্য স্বীকার করা উচিৎ, আশির কবি - কথাকাররা স্বয়ংভু তো নন, তবে এই দশকের প্রধান যাঁরা, তাঁরা যথার্থ আধুনিক, গদ্যভাষায়গালগল্পের পাশাপাশি আখ্যানধর্মীতাকে নিয়ে চর্চা করছেন। কবিদের অনেকেই ইতোমধ্যেই বিশিষ্ট পাঠক হিসেবেআমাকে এই তিনজন কথাকার উৎসাহিত রেখেছেন দীর্ঘদিন।

সত্তরের প্রধান কথাসাহিত্যিকেরা বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন শুধু সৌন্দর্য্যের রচয়িতা হিসেবে তাঁরা পরিচিত হতে চান না, পরবর্তীতে অলোক --- শুভংকর -- দেবব্রতও ছায়া সুনিবিড় কাহিনি রচনার দিকে না গিয়ে, শ্রেণীবিভক্ত গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থার পাশে শহরতলী মানুষের নতুন চেতনা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গির বার্তা নিয়ে আখ্যান সৃষ্টিতে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। পাঠকদের ইচ্ছে-অনিচ্ছের দিকে না তাকিয়ে আরও নিখুঁত ভাবে গ্রামের উঠানের সঙ্গে শহরেরপোর্টিকোকে মিলিয়ে দীর্ঘ অনুসন্ধান চালাচ্ছেন এঁরা মানবমনের। এঁরা সাহিত্য করতে এসেছেন সচেতনভাবে ফলে শিক্ষিত মেধা তিনজনেরই সম্পদ। নির্মাণ কৌশলে এঁরা অনেকক্ষেত্রে ভেঙেছেন প্রথা তাই হয়ত অনেক সময় সহজভেদ্য নয়। বলা চলে, তিনজনের সূচনা পর্বে যে আবেগ ছিল, বেশী বলার প্রবণতা ছিল তা ছাপিয়েও ছিল সম্ভাবনা,একটু নিবিড় পাঠক সেটা সহজেই ধরতে পেরেছিলেন। এঁরা যে সময়ে লেখালিখির মধ্যে এলেন তখন দীর্ঘস্থিতাবস্থার সূচনাপর্ব। এক দশকে রাষ্ট্রকে মুক্ত করা গেল না। স্বপ্ন দেখতে পাওয়াও কম কথা নয়, তাও গেল। তখন গ্রামে নড়চড়া বলতে অপারেশন বর্গা। যা নিয়ে চুটিয়ে লিখেছেন সাধন চট্টোপাধ্যায়, অভিজিত সেন, অমর মিত্র প্রমুখরা।বস্তুত আমরা যারা শহুরে, তারা বর্গ অপরেশানকে চিনলাম এঁদের গল্পে। আশির সূচনাকারীরা অনেকটা যেন অন্তর্মুখী, শিল্পবাস্তবের দিকে ঝুঁকে নিজেদের পৃথকভাবে

চিহ্নিত করতে চাইছিলেন। সত্যি বলতে, এদের ম্যাচিওরিটি আসলে তুলনায় দ্রুত, এদের অগ্রজদের থেকে। আমার এই কথা থেকে বার্তা পৌছাতে পারে যে, আমি বোধহয় বলতে চাইছি আশিতে লিখতে আসা কথাকাররা দলবদ্ধভাবে বিশাল ভাল কিছু লিখেছেন। দশক - সংকীর্তন বা সংঘশক্তির জয়গান আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু আট দশকের প্রতিনিধিস্থানীয় তিনজনকে চিহ্নিত করতে চাইছি, অন্যরকম বলে, শক্তিমান বলে বিশেষ বলে।

এই অন্যরকম হওয়ার টানটাও বড় লোভনীয়, এইটানে শুধুমাত্র গদ্যের পেশী আস্ফালনে হারিয়ে গেছেনকেউ কেউ। কিন্তু এদের লেখার বিষয়বস্তু আছে, ভঙ্গি সন্ধানের চেষ্টাও আছে। অলোক - শুভংকর - দেবব্রত-র যদিমিল খোঁজা যায় তবে সফল হওয়ার কোন কারণ দেখিনা। প্রায় এক সময়ে লিখতে আসা নিশ্চয়ই কোন গুত্বপূর্ণসাধারণ উৎপাদক হতে পারে না। অলোক যখন তার লেখার সময় যৌনতা, তির্যকদৃষ্টি বিন্যাস, আর আবহমানতাকেগুত্ব দিচ্ছেন তখন শুভংকর তুলে আনতে চেষ্টা করছেন মানব হৃদয়ের জটিল জ্যামিতির - প্রকৃতির কণ্ঠস্বর - দুরগামী কল্পনার অসীমতা আর দেবব্রত বর্ণনা করেছেন শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ধবস্ত মূল্যবোধ, সম্পর্কের জটিলতা-বৈচিত্রময় ভূগোলের অন্যন্যতা। তবুও এঁরা তিনজন, যেহেতু প্রায় দু দশক ধরে নিছক চর্বিতচর্বণের পথে না হেঁটে শুধুমাত্র বাংলা কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তুকে প্রসারিত করেছেন তাই নয় নতুনভাবে বলতে চেষ্টাও করছেন তাই এঁরাই আলোচনায়। প্রচলিত পথে সাহিত্য রচনা এতটাই পূর্বঅনুধাবণযোগ্য যে, কতিপয় চিহ্ন ও গোলকাহিনীর বেড়ায়, বোধহীনতায় যন্ত্রণায় কিছুমাত্র শব্দের শবসজ্জার মত। তখন অন্তর্মুখীনতা নামক প্রাচীন কৌশলেও উচচতর অভিযান অসম্ভব। সামান্য পরিবর্তন অথবা নড়াচড়ায় ভৈরব আর জাগবে না, মূলগত তফাৎ আনা দরকার, আমার বিশ্বাসে, এই তিনজন সেই চেষ্টাই করছে বিভিন্নভাবে।

।। অলোক গোস্বামী ।।

পাঠক হিসেবে অলোক গোস্বামী, একজন গদ্যকারকে, নিষ্প্রদীপ আবহে প্রচণ্ড একা, অনিশ্চিত পথের পথিক বলে মনে হয়। অলোক যখন লিখতে আসেন, নবাগতদের পক্ষে অনুমান করা সঙ্গত ছিল যে বিবিধ বিকৃতকাম ও যৌন অভিমানময় অক্ষর সাজিয়েই অন্য ধারার কথা সাহিত্য রচিত হয়। যারা আত্মধর্ষণকে অপমান বলে মনে করেন না, তাদের প্রতিষ্ঠানমুখীতাই একমাত্র নিয়তি। অন্য দিকে নৈরাজ্যের বিস্ফোরণ, সেখানে ইতিহাস - দর্শন ইত্যাদি গুত্বহীন। এর মধ্যে অতি স্বল্প পরিচিত জলধারার মত প্রবাহিত কথাসাহিত্যের একটি ধ্রুপদী ধারা, তীব্র বিশ্লেষণে ধরা যায় এদের লক্ষ্য, বোধহয় সমসাময়িকতাকে ক্লাসিকাল পর্যায়ের দিকে ঠেলে দেওয়া। এ খুব কঠিন ব্রত, অনালোচিত হওয়ার বিপদসংকুল পথ এটা। ইচ্ছে করেই এই ত্রিধারার প্রতিনিধিস্থানীয়দের নাম উল্লেখে গেলাম না (সচেতন পাঠকমাত্রই এদের চিনে নিতে পারবেন, এই আশায়)। ১৯৯৯ জানুয়ারিতে প্রকাশিত অলোক গোস্বামীর 'সময়গ্রন্থি' মনে হতে পারেঅযোনিসম্ভবা, জন্মক্ষণ থেকেই আশর্চ্য যুবতী। আমার এরকম অভিজ্ঞতার কারণ হয়ত এই যে, এর আগে আমি অলোককেপড়িনি। সত্তরের এক অন্যধারার কথাসাহিত্যিক, যিনি বস্তুত পক্ষে বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিটি লেখক, অতিনবীন, সকলের সম্পর্কে অব্যর্থভাবে সন্ধানী, সাধন চট্টোপাধ্যায়, তাঁর মুখে অলোকের নাম শোনা ছাড়া আর কোন পরিচয় ছিল না আমার।

'এরপর বয়ঃসন্ধিকালে এক ঘুম না আসা রাতে, একা একা শুয়ে থেকে, জানলা দিয়ে আকাশের গায়ে একটা ঘড়িকে ঝুলে থাকতে দেখেছিলো পরমানন্দ। ওটার ডায়ালের রং ছিল এতটাই কালো এবং প্রহর সংখ্যা ছিলো এতটাই নক্ষত্র সুলভ যে, প্রথমে ওটাকে ঘড়ি বলেই মনে হয়নি। বরং মনে হয়েছিল জমাট রাত্রির অংশ। মনে হয়েছিলো, কী জানি অচেনা কোনো নক্ষত্রপুঞ্জ কিনা।'

এই পর্যন্ত পাঠ করে মনে হতে পারে, এ এক স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা। অনেককে বলতে শুনি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে বাংলা কবিতার স্থানের তুলনায় বাংলা কথাসাহিত্য বলে পিছিয়ে। এ উদাহরণ পাঠে অন্য অভিজ্ঞতা হয়। গদ্য নির্মাণের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাঙচূর হয়েছে, 'ইমেজারি' ব্যবহারে এই ধরণের সমকালীনতার পরিচয় কমই পাওয়া যায়।মনে হচ্ছিল, কোন বিদেশী লেখায় এই দৃশ্যকল্প! কোথায়? কবিতা! কথাসাহিত্যের প্রাঙ্গণ ছেড়ে সিনেমা - চিত্রশিল্পতে, কোথাও? মনে আসল সালভাদোর দালি, এক অসাধারণ উত্তরাধিকার, তথাকথিত সময়হীনতার ছবি। অনন্তসম্পর্কে ধারণাও খণ্ডিত হতে বাধ্য তবুও কোন কোন খণ্ডই তো অতি বৃহৎ হতে পারে, যা আমাদের ধারণায় সম্পূর্ণের কাছাকাছি। সালভাডোর দালির ছবি, অলোকের গল্প 'পরমানন্দের সময়' আমাকে এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। কয়েকবার পড়ার পর যদি এর নীচের লাইনগুলোকে দেখা যায় তবে বোঝা যায় বর্ণনামূলক ভঙ্গিকে ভাঙাও যায় বর্ণনার উপযুক্ত ব্যবহারে-

'ভ্রম ভাঙিয়েছিলো অদৃশ্য এক ডেমনোস্ট্রেটার। যদিও সেটা আকাশবাণী ধরণের কিছু ছিল না। তবু কে যেন অদ্ভুত এক সংকেতে পরমানন্দকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল সেই আকাশ ঘড়িটার কার্যত্রম।'

একজনের উপস্থিতি, শুধুমাত্র উপস্থিতি, টানা ন্যারেটিভের ক্লান্তি দূর করতে আশ্চর্য সফল হয়ে গেল। অলোক গোস্বামী এই ধরণের 'উড়ন্ত সূচনা'র অধিকারী। মানবজন্মের জন্যে যে রকম সঙ্গম হল অবশ্যকর্ম তেমনি বর্তমানে কথাসা হিত্যেকদের দরকার দ্বৈতচেতনা, অবিশ্বাস, তীক্ষ্ণশ্লেষ আর বিচিত্র মনোভঙ্গি। 'শ্লেষ' অংশটা বাদে আলোকের গদ্যে পাঠক অন্য তিনটি গুণকে চিনে নিতে পারেন অতি সহজে, প্রায় প্রতিটি উল্লেখযোগ্য গল্পে।

ক) ঠিক সেই সময়ে নদী মেলে ধরত দরজা! লোকটা বেড়িয়ে পড়ত গুহা ছেড়ে। হাঁটতে শু করত। হেঁটে হেঁটে যেতে চাইত সেই দিকে, যে দিকটা তার সচরাচর গন্তব্যস্থল নয়। ('আবহমান' - দ্বৈতচেতনা)

খ) আপততঃ এক সাথে ভেসে চলেছে। যে যেখানে আটকে যাবে সেটাই তার স্থান। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা যাত্রা। যে যাত্রা শেষে আবার হয়তো পরস্পরের সাথে আর কোনদিন দেখা হবে না। দেখা হওয়ার দুঃস্বপ্নও কেউ দেখবে না কোনো দিন। তবুও হয়তো দেখা হবে। ('মৃন্ময় যাত্রা' - অবিশ্বাস)

গ) শৈশবেই বালক, বাল্যেই কিশোর, কৈশোরেই যুবক যৌবনেই প্রৌঢ় স্বপ্ন বরাবরই প্রকৃত সময় থেকে নিজেকেই এগিয়ে রেখেছে। ('মধ্যবিত্ত' - বিচিত্র মনোভঙ্গি)

তুলনায় 'শ্লেষ' যা কিনা, আমার বিশ্বাসে, সমকালের অন্যতম চিহ্ন, অলোকের গল্পে অল্প উপস্থিত। অবশ্য সহজাত ভঙ্গিটা এক একজনের এক এক রকম হতে বাধ্য।

অলোক গোস্বামী কলকাতা থেকে দূরে, উত্তরবঙ্গে থেকে লেখালিখির চর্চা করেছেন। কিন্তু তিনি অমিয়ভূষণ হতে চাননি। বলা ভাল, বিষয় ও ভঙ্গিতে তিনি যতটা দেশীয় ঠিক ততটাই সীমানা ভেঙে আন্তর্জাতিক। 'আবহমান', 'পরমানন্দের সময়', 'সময়গ্রন্থি' ইত্যাদি গল্পে একের পর এক হার্ডেল টপকে আলোক উত্তরবঙ্গের সবুজ রেখা ছুঁয়ে পাড়ি দিচ্ছেন পৃথিবীর সেই প্রান্তে, যেখান একজন লোক ভীষণ একা থাকে, সমস্যা সঙ্কুলভাবে থাকে।

উত্তরবঙ্গ অলোকের উপর প্রভাব ফেলেছে কিন্তু চরম আবেগে তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি। এসব ক্ষেত্রে নতুন বিষয় পরিবেশনার লোভে এরকমটা হতেই পারত।

'আকাশ গেয়া হয়, রূপোলী হয়, আর কালো হতে তো জন্ম ইস্তকই দেখেছে বটা। কিন্তু অতো লাল হয়ে উঠতে সেদিনই একমাত্র দেখেছিলো। শুধু কি আকাশ, চারপাশের সমস্ত কিছু লালে লাল।....

...বাপরে কতো কমরেড!' (সময়গ্রন্থি)

অলোক এইভাবে প্রকৃতিকে মিলিয়েছেন মানুষের সঙ্গে ফলে আকাশ, গাছ-গাছলা আর মানুষের অস্তিত্ব পৃথক না হয়ে সমগ্রতায় যুক্ত হয়েছে। আর একই সঙ্গে আঞ্চলিক সাহিত্যের বেড়া ভেঙে তার গল্প যে ধারায় প্রবাহিতহয়েছে তা সা হিত্যের বোধের ধারা, দ্বিতীয় বাস্তবতার ধারা।

অলোক গোস্বামীর বেশ কিছু গল্প পড়ার পর, মূল চিহ্নগুলো আমি যা চিনতে পেরেছি তা হল---

১। বিষাদাচ্ছন্ন একাকিত্ব

২। সচেতন মানবিক অনন্ত জিজ্ঞাসু মনোভাব

৩। পরিবারপ্রীতি ও বিশ্লেষণাত্মক মনোভব

৪। সময় বিষয়ক ধারণা ভাঙার চেষ্টা

৫। প্রচ্ছন্ন কিন্তু শক্তিশালী যৌনবোধ

৬। বর্তমানের রাজনৈতিক নৈতিকতার প্রতি আস্থাহীনতা

এই প্রধান চিহ্নগুলো একজন সমকালের কথাসাহিত্যিক অবশ্যই যুক্ত হবেন, তাই আমাদের কাম্য। একটিপুষতান্ত্রিক গল্প' অলোকের লেখা একটা অন্যধরণের গল্প, অনেকটা স্বীকৃতির মত। গল্পের মূলকথার সঙ্গে একশভাগ একমত না হলেও লেখার ভঙ্গিটা যথেষ্ট আত্মব্যবচ্ছেদের যন্ত্রণাময় খাঁটি। জীবনানন্দের গদ্য, পরিণত যৌনতা গল্পটিতে একাকার হয়ে গেছে।

ক) সাত বছর পেরিয়ে গেলে দাম্পত্য জীবনের রেশারিশিটা মুছে যায়। জেগে থাকে পারস্পরিক বন্ধুতা আর নির্ভরশীলত া।

খ) মনে হচ্ছিলো আকাশ ফাটিয়ে যদি বৃষ্টি নামে তবে খুব ভালো হয়। প্রাকৃতিক শ্যাম্পেন ছাড়া একজন বেসুরের আর কী হতে পারে জয়ের স্মারক?
গ) স্পষ্ট গন্ধ পেয়েছে আফশোষের। কিন্তু এ নিয়ে খারাপ পায়নি।
ঘ) পকেট থেকে একমুঠো টাকা বের করে নবজাতকের পুষাঙ্গের চারপাশ ঘুরিয়ে সুমন টাকাগুলো বাতাসে ছড়িয়ে দিলো।

এইসব বাক্যবন্ধকে আপনি বিশ্বাস না করতে পারেন কিন্তু উড়িয়ে দিতে পারবেন নী। তীক্ষ্ম লাইনগুলো সারা গল্পে এদিক এদিক ঘুমিয়ে আছে। আরও একটি গল্প 'কেঁচো' একালের অন্যতম শক্তিশালী গল্পকার অলোক গোস্বামীকে চিনে নিতে সাহায্য করে। 'মধু এখন ঘুমোবে। দীর্ঘ দিন। একেবারে সত্যিকারের কেঁচোর মতো। তারপর ঘুম ভাঙলে হেঁটে হেঁটে যাবে আরও গভীরে। একদম পাতালে।' গল্পটি, অলোকের ক্ষেত্রে একটি গুত্বপূর্ণ বাঁক, বিষয় -বস্তুর দিক থেকে। অনেকটা পরবর্তী ধাপে যেন আমরা পেয়েছি 'মৃন্ময় যাত্রা' গল্পটি। গল্পটিতে ফিরে এসেছে 'ইডেনটিটি ক্রাইসিস,' যা বর্তমানের আধুনিকতার বাধ্যতামূলক চিহ্। যাত্রাপথই যেন সজীবতা প্রাপ্ত হয়, আখ্যান নির্মাণের অন্যভঙ্গি এখানে অলোকের পাথেয় হয়েছে। বুচুকুন, যতীন, সজেন, ইয়াকুব, হানিফ, টগর, বিন্তি, ময়না নানা চরিত্র, কিন্তু চূড়ান্তভাবে এরা হারিয়ে ফেলে স্বতন্ত্রতা। একটা অভিঘাত বেঁচে থাকতে প্রচ্ছন্নে, মানুষের আদিম কিছু বোধ, পীড়া, যৌনতা, ক্ষিদে ক্রিয়া করে যায়।
অলোক গোস্বামীর গল্পে হয়ত বা থেকে যায় কিছু অপরাধবোধ, যা এতটাই গোপন যে ধৰতে গেলে মনে হয় ভুল হয়ে গেল। 'যাপন শিল্প' গল্পে প্ল্যানচেট করা, মানুষের মধ্যে নানা অমানবিকতাকে খুঁজে, অলোক ঠিক যেনসেই কথাকার যে নিজেকেই প্রতিস্থাপিত করেছেন বহু মানুষের মধ্যে। তারপর অন্যের ভিতর সন্ধান করছে তার আত্মগোপনকারী সত্ত্বাকে।
এইভাবেই অলোক গোস্বামী রচনা করছেন, নিজেকে তুলে আনছেন আধুনিকতার যাবতীয় জটিল অনুসঙ্গকে বহুমাত্রিকভাবে। আর পাঠক হিসেবে তাঁর প্রতি আমাদের প্রত্যাশা, একদিন দীর্ঘ সন্ধানপর্বে হয়ত বা এমন এক উপলব্ধি আবিষ্কার হবে যা যথার্থভাবে অনুরণন তুলবে আবহমানে।

।। শুভংকর গুহ ।।
একথা ঠিক ভারতীয় গদ্য সাহিত্যের শিকড় ভূ - স্তরের এক্কেবারে উপরের অংশের জল-মাটি পেয়েছে, সাধু ভাষা থেকে চলতি ভাষাতে আসতে কেটে গেছে অনেক বছর। কিন্তু এই স্বল্প সময়ে সূর্যের উদয় ও অস্ত কম হল না। রীতি নিয়ে আন্দোলনের পাশাপাশি গল্পের বিষয়বস্তু নিয়ে বিস্তর আলাপ আলোচনা চলার ফলে ছোটগল্পের নির্মাণ এখন প্রায় আন্তর্জাতির স্তরে পৌছে গেছে। ক্রোধ, ঘৃণা, উদ্বেগ, আত্মকেন্দ্রিকতা, জটিল বিন্যাসের সম্পর্ক, সবকিছুই ছোট গল্পের বিষয় বা বিষয়ের রেখা হয়ে আমাদের সামনে।। শুভংকর গুহ যে সময়ে লিখতে এলেন তা এক স্থিরাবস্থা, যখন শান্তি আপতঃ কল্যাণ হয়ে আছে; বাহ্যিক ভাঙনের থেকেও গুত্বপূর্ণভাবে অনেকের অলক্ষ্যে ভেঙে যাচেছ আমাদের অন্দরমহল, বিভিন্ন প্রশ্নের বুদবুদ উঠছে, মিলিয়ে যাচেছ সকলের অলক্ষ্যে। এই পরিবেশে বৃহৎ ক্যানভাসে ছবি আঁকার মত ইচেছ নিয়ে লিখতে শুকরলেন। শুভংকর। বিশালতার জন্যে ধরা পড়ল নানবিধ ভাঁজ, যা কি না সমকালে অতি প্রধান চিহ্। উচচকিত প্রতিবাদের বাহবা ছেড়ে চিরকালের দিকে তাকিয়ে কতগুলো বার্তার কথা লিখতে চেয়েছেন তিনি, প্রথম গল্পগ্রন্থ 'জগন্নাথ বাবুর নির্দেশ যাত্রাতে। ভয়ংকর আর্তি নিয়ে উঠে আসে'গাছ' গল্পটি। অসহায়, তহরি নামে আধপাগল যুবকটি বড় ভাইদের তীব্রতম অমানবিক স্বার্থ চিন্তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে স্থায়ী, নিশ্চুপ গাছ হয়ে যায় শুভংকরের গল্পে বাস্তবতা - অবাস্তবতা ইত্যাদি প্রশ্ন কখনও উঠে আসে না।কারণ রচনাশৈলীতে শুভংকর প্রথম থেকেই বাস্তবতাকে ধরে অবাস্তবতার দিকে এগিয়েছেন অথবা অবাস্তবতা থেকেপৌছে গেছে সমকালের বাস্তবতায়। এজমালি বাড়ি বাবার মৃত্যুর পর ভাগ হয়ে যাওয়ার মত পরিস্থিতিতে ত্রমশ প্রকাশিত হতে থাকে মানুষের ক্ষুদ্রস্বার্থবোধ। দেশজ রূপকতায় যেমন মানুষের পাথরে রূপান্তর ইত্যাদি থাকে তেমনি তহরি গাছে রূপান্তরিত হয়। গল্পটির কাহিনি বিন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে জেগে উঠতে থাকে অন্য কিছু কথা, যাকে বোধহয় দ্বিতীয় বাস্তবতা বলে। 'পোকা' গল্পের ঘুণপোকা ধরা খাট পাঠকের সামনে মেলে ধরে ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পুষতন্ত্রের হিংস্রতাকে, গভীরতাকে সকলের ঘুমে ঘুণপোকার আওয়াজ আমাদের ধবস্ত সমাজ

ব্যবস্থার অনুরূপ হয়ে ধরা দেয়। মধ্যবিত্ত সমাজ, রগচটা বাবা, চির ম্রিয়মান মা, বিধবা পিসি যেমন থাকে আর কি, কিন্তু সব কিছুর মধ্যে একটা গভীর ব্যথা, অস্ফুট প্রতিবাদ কান পাতলে শোনা যাবে।
ছোটগল্পকার হিসেবে শুভংকর, কাহিনি, বিন্যাসে পুষতান্ত্রিকতার বিদ্ধে কিছু বলতে চেয়েছেন। মানুষের স্বভাব উদাসিনতা, প্রকৃতিপ্রেম জেগে উঠেছে বারংবার, 'নদী', 'শালুকফুল', 'জগন্নাথ বাবুর নিদ্দেশ যাত্রা', ইত্যাদি গল্পে। স্বামী - স্ত্রীর সম্পর্ক যেন বা শুভংকরের গল্পে কিছুটা তির্যক, অবহেলায় ধূলো মাথা। এইসব চারপাশের চরিত্রগুলো গল্প হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে জারিত হয়েছে কিছুটা নাটকীয়তায়। সূচনাপর্বে শুভংকর চিহ্ন রেখেছেন তার গভীর মানবিক বোধের। শুভংকরের সেই ৰিাসের সঙ্গে এখন না একমত হতেও পারেন কিন্তু প্রথম দিককার বেশীর ভাগ গল্পে বিষন্নতা, ব্যত্তির সঙ্গে পরিবারের বিচ্ছিন্নতা পাঠকের মনে ধারাবাহিক ত্রিয়া করে যায়।
শুভংকর গুহর মনোবীজ হল একজন উদাসী, যে মুঠোর মধ্যে পেয়েও মাটির ওপর ছড়িয়ে দেয় যা কিছু প্রাপ্তি। ভরা সংসার ছেড়ে জগন্নাথবাবু যাত্রা শু করলেন, অজানার উদ্দেশ্যে কিম্বা কিছুটা উদ্দেশ্যবিহীনভাবেই। কেন? এসব প্ৰ তোলাই যদি কোন গল্পকারের উদ্দেশ্য হয় তবে প্রশ্নের জবাব দেবার দায় তাঁর থাকে না। প্রচলিত ভাবনা দিয়ে গল্পগুলোকে ধরা যাবে না, এমন কি এই নৈতিকতা দিয়ে শুভংকরের গল্পের চরিত্রগুলো নৈতিকতা বোঝা যাবে না। সূচনাপর্বেই এমন এক আখ্যান নির্মাণের সংকেত বহন করে এনেছেন শুভংকর যা কিনা একই সঙ্গে রহস্যময় ও ভারতীয়, তীব্রভাবে। বর্তমান নগর সভ্যতার ক্লান্তি, নৈতিকতার পতন, জড় প্রকৃতির চেতনরূপের সন্ধান, মানবিক শুশ্রূষা সবটাই গল্পগুলোতে ফিরে আসে নানারূপে। হাহাকারের মত আসে মানুষের প্রকৃতিসম্ভোগ - ইচ্ছে।
এই ছিল শুভংকরের সূচনা বিন্দু, তারপর ভূস্তর ফাটিয়ে উৎক্ষিপ্ত জলধারার মত শুভংকর, বিষয়বস্তু রচনাশৈলীতে এখন বদলে গেছেন অনেক। কিন্তু শিকড়ের গুত্বকে অস্বীকার করে বসে নি তাই প্রকটে - প্রচ্ছন্নে মানববোধই এখনও তার প্রধানচর্চার বিষয়। খোলস ছাড়িয়ে ভিতরে বস্তুকে অনুসন্ধানে তুলে আনা প্রতিটি প্রকৃত লেখকের কাজ, শুভংকর ত্রমশ দক্ষতা অর্জন করেছেন এরকম ব্যবচ্ছেদে। এই ধরণের প্রয়োগে নিজেকে নিয়োজিত করতে গিয়ে শুভংকরের কথাসাহিত্যে ত্রমশ চিহ্নিত হচ্ছে কতগুলি দাগ। জন্মদাগ নয়, অর্জিত চিহ্ন। যেমন, গদ্যভাষার সহজ রাস্তার বিদ্ধ যাত্রা এবং দীর্ঘ জটিল বাক্য বিন্যাস, পরাবাস্তবতাতর দিকে স্পষ্ট ঝোঁক, প্রাচীনতার অনুসঙ্গে ভবিষ্যতকে মেলানোর প্রচেষ্টা, সরল রৈখিক চরিত্র চিত্রণের জটিলতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।
সাম্প্রতিককালে শুভংকর গুহর লেখা ছোটগল্পগুলো থেকে খোঁজা যাক এই সমস্ত চিহ্ন, যা তাকে বিশিষ্ট করছে ত্রমাগত।
ক) দিন গেল, রাত গেল, তারপরে আরও বাচ্চাগুলো বড় হতে থাকল, পৃথিবীর বয়স ত্রমশঃ বাড়তে থাকছে...সমুদ্রের জলস্তর বাড়ছে, মহাশত্তিময় সামুদ্রিক ঝড় নিশ্চিহ্ন করল কয়েকটি দ্বীপকে... পারমানবিক চুল্লির পোড়া ইলেকট্রড্স তখন ফেলা হচ্ছে সমুদ্রের গর্ভে, রাষ্ট্রসংঘে দিনের পর দিন আলোচনা গড়িয়ে যাচ্ছে নারীর অধিকারের প্রশ্ন, তখন রাজস্থানের কোন এক রমণী শিশুকে কোলে নিয়ে অনবরত খুঁজে যাচ্ছে খুঁটে খুঁটে, ঘোড়ার বিষ্ঠার থেকে হজমহীন আনাজপাতি ফাঁকা মাঠে ঘুরে ঘুরে। (দীর্ঘজটিল বাক্য বিন্যাস, গল্পের নাম - উদাসী কোলাজ)
খ) বেশি মাত্রায় কর্মাশিয়াল ব্রেক, মাঝে মাঝে চল্লিশ ফুট মাপের ঘুমন্ত মানুষের লাইফ বিবরণ।... পরে জানা গেল লোকটি লম্বায় ৩৯ ফুট ৫.৫ ইঞ্চি। (পরাবাস্তবতার প্রমাণচিহ্ন, গল্পের নাম - ড্রাম পিটাইয়ের শব্দ)
গ) পৃথিবীর এই স্থানের ভূ-খণ্ডটি নিরাপদ ছিল। অথচ গতকাল সন্ধ্যায় বারো সেকেণ্ডের মত হয়ে গেল ভূ-কম্পণ।... বৃদ্ধা কিন্তু আসবে না। তাকে কেকের গুঁড়োদানাও দেবে না। গতকাল বিকালে এএই শহবর ছেড়ে বৃদ্ধা চলে গেল। (নস্টালজিয়ার উত্তরণ, গল্পের নাম - বন্দর আসছে)
ঘ) সোলেমান জানোয়ার কথাটা জোর দিয়ে বলল। এই জোর দিয়ে বলার আড়ালে মনুষ্য প্রজাতির অহংকারটা আর সভ্যতার দাম্ভিকতা চাপা বাদযেন এই বাদ চরিত্র মানুষ বিষাত্ত প্রজাতি। (চরিত্রের জটিলতা বৃদ্ধি,গল্পের নাম - স্বপ্ন দুঃস্বপ্নের যুদ্ধ)
অর্থাৎ কি না বদল, যা লেখকের অবশ্য ঘটে তাই ঘটেছে রচনা শৈলী, বিষয়বস্তু ছাড়াও শুভংকরের মনোজগতে। সেই সাদামাঠা মানুষ রূপান্তরিত হয়েছে আধুনিক মানুষে, সভ্যতার জটিলতার চিহ্ন বহন করে। নিতান্ত ভিজে প্রকৃতিপ্রীতি বদলে গেছে মানুষের ভিতর প্রকৃতিতে, সমস্ত জটিল জ্যামিতিক বিন্যাস নিয়ে। নিরন্তর বলার ইচ্ছে ত্রমশ কাছাকাছি এসেছে

দেশজ ধারার, দেশজ দর্শনের। সুতরাং বলতে চাই সম্ভাবনার স্ফুরণ ঘটে গেছে। বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি ঘটেছে ব্যাপক ভাবে। 'উদাসী কোলাজ' গল্পে মিথের ব্যবহার, ক্রমশ নতুন করে অন্য একটি মিথের সৃষ্টি, পরিবেশিত হয় অনেকটা আরবদেশীয় রূপকথার মত। 'বন্দর আসছে' গল্পে শহরটা হয়ে যায় জাহাজ, যাত্রা শু করে, 'ড্রাম পিটাই...' গল্পে চল্লিশ ফুটের একটি লোক হঠাৎই ঢুকে আসে একটি শহরে। বর্তমানে কনজিউমারেজিমকে ধরার এক অন্য ধারার সৃষ্টি করছেন শুভংকর, তার বিষয় বিন্যাসে।

শুভংকর গুহ-র ছোটগল্পকে পাঠক হিসেবে কতগুলো ভাগ ভাগ করে সৃষ্টির মানচিত্র আঁকতে গেলে ব্যাপারটা এরকম হয় ঃ

।। সমস্যাকে চিহ্নিত করতে অসম্ভবকে ব্যবহার করা ।।

ছোটগল্পের - বন্দর আসছে, ড্রাম পিটাইয়ের শব্দ, দৃষ্টিক্ষুধা, চতুর্থ বৃত্তান্ত ইত্যাদি। ধরা যাক, চতুর্থ বৃত্তান্তগল্পটি, একজন মানুষ আশর্চ্য অনুভব যুক্ত সে। 'মানুষের জীবনে অবসাদ, দুশ্চিন্তা, হতাশা, ক্লান্তি এবং রাত্রির জাগরণ -- দুশ্চিন্তাহীন জীবনের জন্যই নীলাভ ঔষধ আবিষ্কারের নেশায় মেতেছে বছর দশেক হয়ে গেল' জঙ্গলের নতুন ধরণের আশর্চ্য ভেষজ উদ্ভিদের সন্ধান, আখ্যান নির্মাণের ভাঁজে থেকে গেছে 'ফোর্থ ডায়মেন্শান' সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা। ভারতীয় ঐতিহ্যকে বিদেশী গ্রহণ করছে অথচ ঐ ব্যাপারে আমাদের উদাসীনতা বিষয়গুলো ছোটগল্পেরভাণ্ডারকে শুধু মজবুত করেছে তাই ন া, গল্পটাকে করেছে অবশ্য পাঠ্য।

।। মনুষ্যেতর প্রাণী ও মানুষের মর্মতায় অন্য ধরণের বাস্তু বিন্যাস ।।

ছোটগল্পের নাম - একটি না কাহিনীর সূত্রপাত, শেষের সে, স্বপ্নদুঃস্বপ্নের যুদ্ধ, উদাসী কোলাজ ইত্যাদি। ধরা যাক, 'স্বপ্ন - দুঃস্বপ্নের যুদ্ধ' গল্পটিকে। পাহাড়ে বসবাসকারী সোলেমান আর তার ঘোড়া সুখিয়া যে বন্ধনে যুক্ত তা মানবিক বন্ধন। যুদ্ধের ভয়াবহতা, জীবনযাপনের কষ্ট, মাইলের পর মাইল পথ চলা সব কিছুর মধ্যেই, যেন কাঁটার মত খোঁচা দিয়ে যায় সন্ত্রাসব াদী নেতা, হঠাৎই উঁকি দেয় আফগানিস্থান, কম্বোডিয়া। শুভংকরের কলমে 'বাদের গন্ধ কোনই সীমানা মানে নি।' গল্পটি একালের মানসিকতা বহন করছে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, যুদ্ধের বিদ্ধে লেখা গল্প হিসেবে নয় ভিন্ন ধরণেৰ আখ্যান বিন্যাসেই গল্পটি, অন্য গল্পগুলোও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

।। রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য বিন্যাস।।

ছোটগল্পের নাম - দেওয়ালের জাদু, হাতির পাল বোলতা এবং আগ্রাসন বিষয়ক, কাহার কথা, অন্য এক নৌটংকি ইত্যা দি। পাঠক হিসেবে আমার মনে হয়েছিল শুভংকরের গল্পে রাজনীতি যতটা প্রধান্য পাওয়া উচিৎ ছিল তা হচ্ছে না। ইদা নিং শুভংকর ছোটগল্পে দিগন্ত প্রসারিত করতে, নতুন ঘরের দরজা খোলার মত বিবিধ বিষয়ের মধ্যে রাজনীতি গুত্বপূর্ণভ াবে এসে গেছে। নতুন আখ্যান রচনার যে ধারা শুভংকর ইদানিং চর্চা করেছেন সেখানে প্রত্যক্ষে কিম্বা পরোক্ষে ঢুকে অ াসছে রাজনৈতিক সমীকরণ। যেমন 'অন্য এক নৌটংকি' গল্প, ভারতবর্ষের গ্রামে সমান্ততন্ত্রের অবশেষকে বাঁচিয়ে রেখেছে এখনও কয়েকজন ধনিকশ্রেণীর মানুষ। এমন একজনের পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রামেনৌটংকির দল আসে। সেখানে স্ত্রীর সাজে ন াচ করা পুষ, গ্রামের নিম্নশ্রেণীর লোক, জাতপাত ইত্যাদি জটিল সমীকরণ সবই উঠে এসেছে বর্তমানের বাস্তবতায়। বিহ ারের গ্রাম, কিন্তু এখন সেখানে বাস চলে, পাশাপাশি জীদ্দী ঠাকুরের রাজও চলে। সমস্ত গল্পের প্রচ্ছন্নে মানবতা আর বর্তমান গ্রামের রাজনীতি ফিরে ফিরে এসেছে। 'হাতির পাল বোলতা এবং আগ্রাসন বিষয়ক' নামক গল্পেও মূল না-বলা কাহিনিটা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, আন্তর্জাতিক রাজনীতির কথা, হিংগল, যে গোটা জীবন ধরে যাত্রায় একটা বড় ভূমিকায় অভিনয় করতে চায়, তার এই চাওয়ার সঙ্গেমধ্যবিত্ত সাধারণের স্বপ্ন পুরণের সাঁকো নির্মিত হয়েছে। হতাশার চরম পর্বে 'সারা শরীরে অপমান ্য লজ্জার ঘাম তার পায়ের পাতা পর্যন্ত ছ্যাঁপছ্যাঁপ করছে। অনেকটা হেঁটে এসে। যেন ব াতাসের মতন হালকা। ওজনহীন। আখ গাছের গোড়ায় বসল। তৃষ্ণার্ত জুট ব্যাগের ভিতর থেকে বাসন্তী ব্রাণ্ড উইপোকান াশক গলায় ঢেলে দিল। তখন নিঝুম রাত।' গল্পটি আত্মহননের গল্প না হয়ে ঝিমানবতার গল্প হয়েছে শেষের কয়েকটি ল াইনে।

শুভংকর বর্তমানে আখ্যান নির্মাণের নিরিক্ষায় মগ্ন, আর কে না জানে, আখ্যানে ঢুকে যায় সমস্ত পারিপার্শ্বিক। একজন সমক ালীন মানুষের চিন্তার বিচিত্ররূপ ধরার জন্যে শুভংকর গুহ চেষ্টা করছেন, এই চেষ্টা তাঁকে ক্রমশ নতুন বিষয় বস্তু শুধু নয়

প্রকাশভঙ্গিগত বৈচিত্রও সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। অর্থাৎ কি না অলোক গোস্বামী আর শুভংকর গুহ চিন্তাশীল স্রষ্টা লেখক হিসেবে এখনই যথেষ্ট গুত্বপূর্ণ, আমার বিশ্বাসে। ছোট গল্পের আধুনিকতা ইত্যাদি গুত্বপূর্ণ বিষয়ে এঁদের কাজ এই মন্তব্যের যথেষ্ট প্রমান।

।। দেবব্রত দেব ।।

ক) রাজপথের ধারে বসে বিষণ্ন আক্রোশে যে পাগলিটা দেখিয়েছিল---- কীভাবে দুটো বুক টিপে ফ্যাকাশে কণ তরল ঢেলে ধুয়ে দিতে হয় সভ্যতার পিচ। (অন্য কেউ)

খ) দেশ! হেই দেশ কী আর আছেরে বাই। কত বেডায় যে চুইষ্যা খায় এই মাগীরে! (ইচ্ছে - নদী)

গ) মানুষ মানুষকে ছুঁলে যে ছোঁয়ার কোন দাগ পড়ে না।। কিন্তু আয়নায় আঙ্গুলের দাগ পড়ে। মানুষের আঙ্গুলের দাগ। (গাড়ি গোরস্থান)

ঘ) শরীরের ভিতর তোরও আছে একটা খোলা মাঠ। একটা নিশ্চিদ্র কুঠুরি। তুইও বানাস; মুহুর্ত। হু হু বাতাস সেই মূহূর্তে তোরও শরীরে প্রবেশ করে। বইতে থাকে মাঠ বারবার। (আরও এক রূপকথা)

ঙ) আজকাল জীবন খর্ব হতে হতে স্পর্শে এসে ঠেকেছে। (মাটি)

দেবব্রত দেব এইভাবেই গড়ে তোলেন তাঁর ছোটগল্প। পটভূমি হয়ত বা ত্রিপুরা, মানুষ নিশ্চিত ত্রিপুরার কিন্তু উপলব্ধির আন্তর্জতিকতায় দেবব্রত একজন, বিশিষ্ট কথাশিল্পী, শুভংকর বা আলোকের তুলনায় দেব্রতর গল্পের সংখ্যা বেশি, প্রকাশিত ছোটগল্পের বই- এর সংখ্যাও বেশি। ত্রিপুরার অতিপরিচিত এই গল্পকারকে বৃহত্তর বাঙালী পাঠক সমাজ এখনও সেইভাবে চিহিত করেন না তার কারণ দেবব্রত গল্প বলেন বটে তবে গল্পের সঙ্গে আরও কিছু বলেন, যা হয়ত বা, অনেকে সেইভাবে, অনায়াসে, সাধারণ বাংলা ছোটগল্প পাঠের অভ্যাসের সঙ্গে মেলাতে পারেন না। শোনা যায় 'বিগ্রাম', পৃথিবী না কি হাতের মুঠোয় অথচ সমকালে অন্তত সাহিত্য জগতে, কলকাতার বাইরে থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা আরও যেন কঠিন হয়ে যাচ্ছে। অথচ আগে সতীনাথ ভাদুড়ি, অদ্বৈত, শরদিন্দু, বনফুল প্রমুখরা ছিলেন। এই সেই অর্থে কলকাতার হাতার বাইরে কেউ আর তেমনভাবে আলোচিত নন, আলোচনা করা হয় না। অথচ একই স্থানে যদি কলকাতার বাইরের সাহিত্য আর কলকাতার সাহিত্যকে রাখা যায় তবে বোঝা যায়, কী বিপুল অনাচার চলছে চারদিকে। দেবব্রত পাঠকের সমানে ত্রিপুরাকে তুলে আনেন না, চিত্রিত করেন ত্রিপুরার মানুষদের। আর কে না জানে মানুষমাত্রই জটিল, হৃদয়রেখায় চূড়ান্তভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে লেখা 'মাটি' গল্পটি কুঞ্জলতা নামক বৃদ্ধার গল্প না হয়ে সমস্ত বাঙালী প্রৌঢ় নারী সমাজের দলিল হয়ে ওঠে তাই। ব্যক্তি কুঞ্জলতা যখন ত্রিপুরা উপত্যকায়, বিধবা; দিন কাটে, স্বামী ফরেস্ট অফিসার। তার 'মইল্টার মা' সম্বোধনের আন্তরিকতা, তা অনেক বিধবা অনেক বাঙালীর ঘরে অতি দুঃখে স্মরণ করেন। আশ্চর্য দক্ষতায়, কুঞ্জলতার সেই দিনের বিশ্বাস 'শেষ গর্ভধানে নারীর আত্মমর্যাদার ঘন্টা' উঠে এসেছে। পুত্রের মৃত্যু, আহা রে, 'পুত্রের মৃত্যুতে মায়ের কাজ কই! এক, বহন করা ছাড়া।' কী দক্ষতায় আঁকা হয়! গল্পটা কখনও কখনও কবিতার বিকল্প হয়ে ওঠে, যেমন কুঞ্জলতার স্বামীর মৃত্যু মুহূর্তে '---মন্টুর মা, ডাইক্কো না। কারোরে ডাইক্কো না। একলা, তুমার সামনে মরণ--- পালন করেছেন কুঞ্জলতা। পালনে কোন চুক রাখেননি কোনকালে। সেই রাত্রি শেষে ফরেষ্টবাবুর শেষ রক্ত বিন্দু কোল পেতে ধারণ করেছিলেন।' স্বামীর মৃত্যুর বর্ণনায় 'সে রাতেও কবুতর উড়েছিল সারা দেহ জুড়ে। অন্ধকারমুখী কবুতর।' এরকম মর্ম বিদারক আমার খুব বেশী পড়া নেই।

হ্যাঁ, দেবব্রত ছোটগল্পে কাহিনি না বলে পারিপার্শ্বিক বলেন, আখ্যান নির্মাণ করেন অনন্যতায়। আর সত্য এই যে বর্তমানে, আমার বিশ্বাসে, আখ্যান অসম্ভব শক্তিশালী তার বিস্তার রেখাও অনন্ত। দেবব্রত দেব 'মাটি' গল্পটি বাংলা ছোটগল্প ভাণ্ডারের স্থায়ী সংযোজন করেছেন, সন্দেহ নেই। দেবব্রত দেব দুঃসাহসিক ভাবুক নন, তাঁর চিন্তাকটুগন্ধময় বাস্তব থেকে ক্রমশ ছড়িয়ে যায় মুক্ত আকাশে, অপরিসীম উচচতায়, তাঁর নির্মাণের অন্যতম উপাদন নস্টালজিয়া যদিও নৈশ চিৎকার, যৌনতা যা সাধারণত শীর্ণকায় লেখকেরা এড়িয়ে যান, তাই দেবব্রতর চর্চার বিষয় হয়ে ওঠে। 'কোন কোন দিন' গল্পটির সেই মৃতদেহ আর তার চারপাশের মানুষজন মধ্যবিত্ততার প্রতিফলন, ছোট ইর্ষা, লজ্জা, বিশ্বাসহীনতা যা বর্তমানের অলংকার, ফিরে ফিরে আসে।

'মনে হলো একটা আস্ত নদী ঢুকে পড়েছে শরীরে। কেন ঢুকে পড়ল। কেমন ফুঁসে উঠছে সেই নদীর অন্তর্গত স্রোতা। মাইয়া

লো, তুই কার মাইয়া! কার মাইয়া গো তুই, মাইয়ানি।' মানুষের পালিয়ে যাওয়া মন, অস্বীকার করাদৈনন্দিন পরাজয় ক্রমশ রক্তাক্ত হয়ে ওঠে।

'দাঙ্গার আগে ও পরে,''মনসামঙ্গল', 'শনাক্ত' ইত্যাদি গল্প এতটা সমকালের, মনে হয় চারপাশ থেকে ক্রমশ চেপে ধরছে। এই যেশ্বাসরোধকারী পরিবেশ রচনা, সেটা দেবব্রত দেবের গল্প নির্মাণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই নির্মাণ পদ্ধতি নতুন না হলেও যথেষ্ট প্রয়োজনীয়, আর কে না জানে কোন কোন পদ্ধতি বহু ব্যবহারে আরও ধারালো হয়ে ওঠে।

'এই আমি দিগন্ত' গল্পে স্বপ্ন, নির্মাণ ও রূপান্তর, হয়ত বা মনে আসে 'অমলকান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল,পংক্তিটা, তবুও আরও কিছু, যা কপোতাক্ষী নামে ভাবা কিশোরী প্রেমিকাকে মনে করায়, বুজিয়ে দেয় বর্তমানে স্বপ্নও বহু কৌণিক। গল্পটির গঠনশৈলী এক অপ্রতিরোধ্য টান সৃষ্টি করে, অবিরাম পাঠ করে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। 'পাখি' গল্পেও ফিরে আসে এক নতুন দিগন্তের ইশারা। পূর্ব বাঙালার ভাষাকে ব্যবহার করে অত দ্রুত চরিত্ররা পৌঁছে যান মাটির কাছাকাছি। দেবব্রত দেবের রাস্তা তাই অনন্য। 'আরও এক রূপকথা', 'কুই', ইত্যাদি গল্পে চরিত্রগুলি যেন বা আস্তে আস্তে খোলস ছা ড়িয়েছে। বাইরে থেকে ভিতরে পৌঁছে যাওয়ার এই ভিন্নযাত্রায় সহজ ও বিকল্প কোন পথ নেই বোধকরি। তাই দেবব্রতর পথ তুলনায় রক্তপথ, যন্ত্রণাপথ।

দেবব্রত দেবের অন্বেষণের মূলবাহুগুলো চিন্তায় যা বোঝা যায় তা হলঃ--

ক) দুঃখ - শূণ্যতার মধ্যে মানবিকবোধের উন্মোচন

খ) হৃদয়হীন জটিলতার পাশে আশর্চ্য সরল গ্রামীন মন

গ) আবরণ উন্মোচন প্রক্রিয়া দ্বারা ক্রমাগত মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে আঘাত করা।

ঘ) সরল পরিস্থিতিকে ধীরে ধীরে জটিল বিন্যাসে নিয়ে যাওয়া

ঙ) দ্বিতীয় এক পৃথিবীর সন্ধান, এক কল্পনার সুন্দর পৃথিবী

এই ধরণের বিষয় কে স্বচ্ছতা নিয়ে নিয়ে গল্পে চূড়ান্তভাবে সফলতায় প্রযুক্ত করা যে দক্ষতার দাবী রাখে তা আশর্চ্যজনক ভাবে তণ কথাসাহিত্যিক দেবব্রত দেবের মধ্যে উপস্থিত। জীবনকে গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায় যে, সাফল্য ও ব্যর্থতা যুগপৎভাবে থাকাটাই স্বাভাবিকতা। দেবব্রত সৃষ্ট চরিত্রগুলোও এই নিরিখে যথাযথ; বাংলা ছোটগল্পের ভূগোলকে বিস্তৃত করাই সুধু তার উদ্দেশ্য নয়, অচেনা পরিবেশে মানুষগুলোর ব্যবহার কেমন হয় তাই দক্ষতায় অনুসন্ধান করেছেন তিনি।

গল্পে দেশজ উপাদানের ব্যবহার, রূপকথা, মিথকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক বিন্যাস সৃষ্টি করা, প্রাচীন নির্মাণকে ভেঙে পুণঃনির্মাণের সার্থক প্রয়োগের অজস্র উদাহরণ দেখা যায় দেবব্রতর গল্পে। 'গঙ্গাচরণের চংপ্রেঙ' গল্পেচংপ্রেঙের অলৌকিক, আশর্চ্য শব্দে মনের গহনে স্থির প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, এবং রূপকথায় পাখি নুয়াইরাজা জেগে ওঠে। বিগ্রাছা নামের যুবকের জাগরণের পর তারা ছিরঙগতি নামের যাদু আংটি নিয়ে চিরদুঃখিনী যুবতী কলমদার কাছে যায়। তৈরী হয় এক নতুন রূপকথা, অপূর্ব আঙ্গিকে। মিথ নির্মাণ এবং বিনির্মাণ করার জন্যে যে, কুশলতা প্রয়োজন তা দেবব্রত অর্জন করেছেন দীর্ঘ চেষ্টা দ্বারা। প্রায় ত্রিশ বছরের একটা প্রচেষ্টা কাহিনি বলার অতিরিক্ত আরও কিছু বলার জন্য আজ একটা পর্যায়ে এসে নানা পরীক্ষা - নিরীক্ষার দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে। দেবব্রতর গল্পে আধুনিক মানুষজন গভীরে বহন করে নিয়ে যায় প্রাচীন ঐতিহ্যকে। মানুষের আপাত সরল স্বাভাবিক সম্পর্কের মধ্যে ধীরে ধীরে উঁকি দেয় আধুনিকতার জটিল বিন্যাস। অথচ কথ াকার দেবব্রত কখনও প্রকৃতিপ্রেমে বিভূতি হতে চান নি, তার পৃথিবীর মানুষজন দুঃখে, পাপে, ভয়ে, আপোষে, ক্লান্তিতে, ক ামে, দ্বিধায় বর্তমানের মানুষের অতিরিক্ত কিছু নয়, বিচ্ছিন্নতা, অস্থিরতা বিষয়গুলো যেন দেবব্রতর চরিত্রগুলোর মনের মধ্যে গুঁড়ি মেরে আছে, খুঁজে নিতে হয়। 'অন্তস্থল', 'আরও এক রূপকথা', 'যতনলক্ষ্মীর গেরস্থি' ইত্যাদি গল্পে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন দেবব্রত। যতনলক্ষ্মী, বিশুরাইচরিত্র হিসেবেও অন্যমাত্রায় যুক্ত হয়ে ওঠে। যেন বা একটা কষ্ট বয়ে চলে অথচ চে াখের জল দেখা যায় না, এমনই উপলব্ধি আমার পাঠক হিসেবে দেবব্রতর গল্প পড়ে। এই পর্যন্ত, তারপর যদি আবার ফিরে পড়ি দেবব্রতর গল্পগুলো তবে ক্রমশঃ বিচলিত হওয়া ছাড়া অন্য পথ থাকে না।

অলোক গোস্বামী মুলত নাগরিক; ধ্বংসপ্রিয়; প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক, শুভংকর গুহ প্রধানত শান্ত চেতনাযুক্ত, উদাসী, সন্দেহপ্রবণ, দেবব্রত দেব বিশ্লেষণপ্রিয়; পরিবেশ ও ব্যক্তির সংঘাতের দ্বারা কিঞ্চিত উত্তেজিত, অন্তরখনন প্রিয়, তবুও এদের মধ্যে ধারাবাহিক মিল হয়ত বা অলক্ষ্যে থেকে যায়। তিনজনই

১) অতি সরলতার বিদ্ধে, শবদেহে এঁরা কোন স্বাদু গন্ধ আশা করেন না।
২) কিছুটা দূরত্ব প্রিয়, যে দূরত্ব মানুষকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা দেয়
৩) এদের গল্প আর সমতলে, সরলরেখায় আবদ্ধ থাকতে চাইছে না।
এইসব উপাদন সকল সমকালের লেখকদের মধ্যে পাওয়া যায় না। হয়ত এইসব লক্ষণই এদের বিশেষ করেছে। যখন দার্শনিকরা আপাত সম্পর্কহীন দুটি বা ততধিক বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারছেন তখন এদের গল্প পাঠেও খুঁজে পাওয়া যায় বিচিত্র গতিপথ, যা ছিল পূর্বে অনির্ধারিত, অচিন্তনীয়। ঝাঁকুনিটা লাগে সেটা সামলোতে পারলে পরবর্তীতে এগোনো যায়।
আমি বিশ্বাস করি সত্তরের পর 'সব ফাঁক' গোছের মন্তব্যের বিদ্ধে অতিদ্রুত দাঁড়ানো দরকার, সে ক্ষেত্রে সামনে যাঁদের দাঁড় করাতে হবে তাদের মধ্যে অলোক গোস্বামী, শুভংকর গুহ আর দেবব্রত দেব অন্যতম। সোজা কথায় ভাল লিখলেই আজকাল দৃষ্টি আর্কষণ করা যায় না, ধারাবাহিক সৃজনশীলতা, স্থিতাবস্থার সঙ্গে সংঘাত দরকার। আমার বিশ্বাস আমার এই ত্রয়ী, যেহেতু বিশেষ মেধাচিহ্যুক্ত তাই এদের আলোচনা অতি দ্রুত, ত্রমাগত হওয়াদরকার। তারপর পাঠকের জন্যে স্বাধীনতা, গভীর প্রবেশের, গ্রহণ কিম্বা বর্জনের।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com